সুখ দু:খের মর্ম

সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

সুখ দুঃখের মর্ম

সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

সুখ দু:খের মর্ম

সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

প্রকাশক: সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০১৯

প্রচ্ছদ: দি কাসওয়া কম্পিউটার, সিলেট

মুদ্রণ: দি কাসওয়া কম্পিউটার, সিলেট

মূল্য: ত্রিশ টাকা মাত্র।

Reality of Happiness and Sorrow by Syed Badiuzzaman Faruque.

উৎসর্গ

জান্নাতবাসী আম্মাজানের মাকাম বুলন্দির আশায় তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

সূচী

১

সূচনা

আল্লাহতায়ালা বলেন, ”দুনিয়ার উপর কিংবা (ব্যক্তিগতভাবে) তোমাদের উপর কোন বিপর্যয়ই আসেনা- যা সৃষ্টির (বহু) আগেই (বিস্তারিতভাবে) একটি গ্রন্থে লেখা রয়েছে, আর আল্লাহর জন্য এ কাজ অত্যন্ত সহজ।” (সূরা আল হাদীদ: আয়াত ২২)।

অন্য এক আয়াতে অল্লাহ বলেন, ”আল্লাহতায়ালার অনুমতি ব্যতিত (কারো উপর) কোন বিপদই আসে না; যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে

সুপথে পরিচালিত করেন; আর আল্লাহ সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছেন।” (সূরা আত তাগাবুন: আয়াত ১১)।

আমার আপনার সকলের সৃষ্টি, বর্ধন, অপচয়ন, ও মৃত্যু আল্লাহর মহান কর্মকৌশলে সম্পন্ন হয়। এই কর্মকৌশল বহুধাবিভক্ত। যদি পার্থিব জীবনে কেবল সুখ আর সুখই থাকতো তবে মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কোন অবশ্যকতা থাকতো না। অন্যদিকে পার্থিব জীবনে যদি কেবল দু:খই থাকতো তবে সুখ কী চীজ তা জানাই হতো না। সুখ সৃষ্টি করে আল্লাহ দু:খকে চিনিয়েছেন আর দু:খকে সৃষ্টি করে সুখকে চিনিয়েছেন। সুতরাং সুখ ও দু:খ উভয়ই জরুরী এবং তা আখেরাতকে অত্যাবশ্যকরূপে উপস্থাপন করে। তদুপরি মানুষকে পরীক্ষা করে

মান যাচাই করার সর্বজনীন উপায় হলো - সুখ ও দু:খ। মানুষকে পরীক্ষা করার কারণ হলো- মানুষের মধ্যে যে যোগ্যতা দিয়ে দেয়া হয়েছে- সেই যোগ্যতা মানুষ নষ্ট করে ফেলে না কি তা কাজে লাগিয়ে প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করে সেই সত্যের সাধনায় লিপ্ত হয়।

সত্যসন্ধানী যারা সফল হয়েছেন, তারা জানেন এ দুনিয়া ক্ষণিকের। কখন মৃত্যু এসে প্রাণ হরণ করে ব্যক্তিকে পরকালের পথে রওনা করিয়ে দেয় তা কোন ব্যক্তিই জানেনা। সুতরাং জীবনকে দীর্ঘ ভাবার কোন যৌক্তিক কারণই নেই। এ জীবন, আল্লাহর কথায়, এক সকাল বা এক বিকেলের সমতুল্য। এই স্বল্প সময়ে মানুষ কী অর্জন করতে পারে যা তাকে দুনিয়ায় দীর্ঘ জীবন, অঢেল সুখ এনে দেবে? আর যদি সব

হারিয়ে যায় এবং দু:খ গ্রাস করে- তবে সেই দু:খ কতক্ষণ সইতে হবে? এক সকাল বা এক বিকেল বই তো নয়।

সুতরাং সুখ এবং দু:খকে বড় করে দেখার কোন সুযোগই মানুষের নেই। এ কারণেই উল্লেখিত প্রথম আয়াতের পরই আল্লাহ বলে দিয়েছেন- ”তোমরা কিছু হারিয়ে ফেললে বিমর্ষ হয়োনা- কিংবা অপ্রত্যাশিত কিছু মূল্যবান বস্তু বা বিষয় পেয়ে গেলে হর্ষোৎফুল্য হয়ো না।”

অন্যকথায় সুখ দু:খের সাগরে নিমজ্জিত হয়ো না। হও কেবল আল্লাহমনষ্ক। আল্লাহকে অভিভাবক মেনে নাও। তিনি বলেন যে, তোমরা বল আমাদের জীবনে এমন কিছুই ঘটবে না যা আল্লাহ লিখে রেখেছেন আমাদের জন্য তা ছাড়া। আর তিনিই অভিভাবক।

সুতরাং মুমিনরা যেন আল্লাহর নিকটই ভরসা স্থাপন করে।

এ ক্ষুদ্র পুস্তিকা উপরোক্ত কথাগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবে সংক্ষিপ্তরূপে। আশা করি পাঠক তা পাঠ করে উপকৃত হবেন।

(প্রফেসর ড.) সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

অক্টোবর, ২০১৯ ঈসায়ী। শাবিপ্রবি, সিলেট।

২। কেন সুখ?

পৃথিবীতে অসংখ্য অগণিত মানুষ বাস করে যারা সুখ কি তা জানে না। তাদের জীবনে কোন সুখ নেই। অপরদিকে অসংখ্য মানুষ আছে যারা সুখের সাগরে ভাসছে। কেন এই বৈপরিত্য?

আল্লাহ তায়ালা এক ও একক। অত:পর আর কোন কিছু বিশ্বজগতে নেই যা একটি। সবকিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। আর

আল্লাহতায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন বিবিধ কারণে তার মধ্যে একটি হলো মানুষকে পরীক্ষা করে দেখা কে কর্মে উত্তম বা অধম। উত্তম ও অধম আবার জোড়া হলো। পরীক্ষার বিষয়টিও একজোড়া, সুখ ও দু:খ।

এখন আমরা দেখব, কেন সুখ দেয়া হয়। আল্লাহতায়ালা মানুষকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। সর্বপ্রথম নিয়ামত হলো নিজ জীবন যার অস্তিত্ব আল্লাহর দান। অত:পর অত্যন্ত সুন্দর অবয়ব ও দেহ দিয়েছেন তিনি মানুষকে। অত:পর মানুষকে অসংখ্য যোগ্যতা দান

করেছেন। মহাবিশ্বের কোন মাখলুক এতসব নেয়ামতের অধিকারী নয়। অগনিত নেয়ামত, যোগ্যতা, সৌন্দর্য্যকে আল্লাহতায়ালা টিকিয়ে রাখছেন তাঁর নিজ অসীম ক্ষমতা বলে।

মানুষের এই অবস্থান একটি দাবীকে অনিবার্য করেছে। সেটি হলো– মানুষ আল্লাহর মহব্বত অন্তরে পোষণ করবে। আল্লাহকে স্রষ্টা, পালনকর্তা, হুকুম দাতা, সর্বপরি একমাত্র সত্তা হিসেবে গ্রহণ করবে যাকে সদা সর্বদা মান্য করা হবে, ভালোবাসা হবে, যার নির্দেশাবলী পালন করা হবে। এই মহান সত্তা আল্লাহ মানুষের

মালিক আর মানুষ তাঁর দাস। সুতরাং অনিবার্য দাবীটি হলো মানুষ সদা সর্বদা আল্লাহর দাসত্ব করবে। দাসত্বের কিছু নিয়ম-নীতি থাকে। যদি একটি নির্দেশকে অমান্য করা হয় তবেই দাসত্ব প্রশ্নের মুখোমুখি। এখন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে দুইটি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। একটি হলো ঈমানের পথ অন্যটি হলো অস্বীকার বা কুফরের পথ। এই দু'টি পথ আল্লাহ এজন্যই দিয়েছেন যেন তিনি যে অসংখ্য নেয়ামত মানুষকে দান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা আদায়কল্পে মানুষ আল্লাহর দাসত্ব মেনে নেবে

সর্বান্তকরণে, দাসত্বের দায়িত্বাবলী পালন করবে। সুতরাং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে যে মানুষ সদা সর্বদা আল্লাহর ইবাদত, অর্পিত দায়িত্বাবলী সম্পাদন করবে সেই হলো আল্লাহর বান্দা। যে এর বিপরীত করবে সে না শোকর, আল্লাহকে অস্বীকারকারী।

পরবর্তী কথা হলো– মানুষের মন, অন্তর, হাত-পা, মস্তিস্ক, মুখ, স্নায়ুতন্ত্র, সুখ উপভোগ করার প্রেরণা ও আকর্ষণ ইত্যাদিও আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন। এখন মানুষের দায়িত্ব হলো- সুখে বলবে আমি আল্লাহ বিশ্বাসী, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে

ইবাদত করবে আর অন্তরের গভীরে আল্লাহর মহব্বত পোষণ করবে।

কেই সহজে বলতে পারে আমি আল্লাহর বিশ্বাসী। কিন্তু যখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে দাসত্বের কাজটি তার করার কথা তখন সে তা না করতে পারে। অর্থ্যৎ মানুষের মধ্যে ডাবল স্টান্ডার্ড রয়েছে। কেউ যদি অন্তরের গভীরে সু-কঠিন ও সুনিপুনভাবে আল্লাহর ভালোবাসা পোষণ করে তবে সে মুখে আল্লাহর বিশ্বাসের ঘোষণা দিয়ে থেমে যাবে না বরং সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আল্লাহর দাসত্বে লিপ্ত থাকবে।

এতটুকু আলোচনায় এটা এখন স্পষ্ট যে, মানুষকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে সে প্রকৃত আল্লাহর আশেক কিনা। আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির প্রত্যেকটি সদস্যকে পরীক্ষা করেন সে কি মুমিন না কাফের? আর এর পরীক্ষার প্রধান দু'টি উপায় আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন– (১) সুখ ও (২) দু:খ সৃষ্টি করে। সুখ হলো মানুষের সকল প্রয়োজন সহজে পূরণ হওয়া। দু:খ হলো প্রয়োজন কিছু পূরণ হওয়া, কিছু পূরণ না হওয়া। এই দু'টি বিষয়েই রয়েছে স্তরের উপর স্তর এবং স্তরের নীচে স্তর। সুখের স্তর হয়

উর্ধগামী আর দু:খের স্তর হয় নিম্নগামী। অর্থাৎ মানুষ সুখে ভাসতে ভাসতে উপরের দিকে যেতে পারে অথবা দু:খে নিমজ্জিত হয়ে নিচের দিকে ডুবে যেয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। এখন কেউ যদি এমতাবস্থায় আল্লাহকে ভুলে যায়, আল্লাহর দাসত্ব করা ও মহব্বত করা থেকে বিরত হয় – সে আল্লাহর পরীক্ষায় ফেল। আর যে বা যারা সুখেও আল্লাহকে ভুলেনা ও দাসত্বের কর্মে বিরত হয় না সে পাশ। আর যে দু:খের সময়েও আল্লাহর মহব্বত পোষণ করে ও আল্লাহর দাসত্বে লিপ্ত থাকে সেও পাশ। আর

আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি এই দু'টি অবস্থা সুখ ও দু:খ, উভয়টির মধ্যেই এই সম্ভাবনা রেখে দেয়া হয়েছে যে– তা মানুষকে আল্লাহর নিকট থেকে সরিয়ে ধীরে ধীরে বা দ্রুতলয়ে কুফরের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

অতএব সুখ সৃষ্টি করা হয়েছে এজন্যে যে মানুষকে তা আল্লাহর নিকটবর্তী করে, না আল্লাহর সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করে তা যাচাই করার জন্য।

সুখ সহজেই মানুষকে ভুলিয়ে দেয় আল্লাহর দাসত্ব করার কথা। যখন সুখ বাড়ে তখন

অনেকেই নামাজে গাফেল হয়ে যায়, রোজার কথা ভুলে যায়, অন্য মানুষের প্রতি তার দায়িত্বের কথা ভুরে যায়। এভাবে ধীরে ধীরে বা দ্রুতলয়ে মানুষ আল্লাহ থেকে দূরে সরে যেতে পারে। আল্লাহতায়ালা তাই সুখ দেন মানুষকে এটা দেখার জন্য যে– সেকি আমা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে নাকি আমার নিকটবর্তী হচ্ছে? এতটুকু বলার পর, কেন সুখ এই প্রশ্নের জবাবের জন্য আর কিছু বলার থাকে না। তবু আমি আরো কিছু বলবো।

এ জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ সৃষ্টিজগত ক্ষণস্থায়ী। তবে তাহলে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে এত কঠিন পরীক্ষা কেন? জবাব হলো– এই সুখের পরীক্ষায় বা দু:খের পরীক্ষায় পাশ বা ফেল অনিবার্য করে তোলে একটি পুরস্কার বা একটি তিরষ্কারকে। আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষার সময়কে সংক্ষিপ্ত করেছেন আর পরীক্ষায় পাশের পুরষ্কার উপভোগ করার সময়টি নির্ধারিত করেছেন সুদীর্ঘ বরং অনন্ত। মানুষ স্বল্প একটু সময় সুখ পেয়ে যদি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হয়, তবে আল্লাহ তায়ালা সেই মানুষের সুখকে

বহুগুনে বর্ধন করে অনন্তকালব্যাপি উপভোগ করতে দেবেন। এই বিষয়টি অনিবার্য করেছে মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী আখেরাতকে। পরীক্ষা না দিয়ে কেউ যেমন কোন ডিগ্রী বা উপঢৌকন পায় না– তেমনি আল্লাহও পরীক্ষা না করে কোন পুরষ্কার দেবেন না। সুখকে বা দু:খকে বড় করে দেখার অবকাশ তাহলে রইলো কি? না, মূল প্রশ্ন, কেন সুখ বা কেন দু:খ নয়। মুল প্রশ্ন হলো– তুমি কি আল্লাহকে রব ও ইলাহ হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট? যদি সন্তুষ্ট হযে থাক তবে তার দেয়া প্রতিটি সুখের জন্য তুমটি কৃতজ্ঞ হবে।

যদি আল্লাহকে রব ও ইলাহ হিসেবে পেয়ে তুমি সন্তুষ্ট না হও– তবে যত নেআমতই তুমি পাওনা কেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা যার দিকে যাওয়া উচিত সেদিকে গেলো না। তুমি হয়ে গেলে তোমার নিজের খায়েশের দাস। তুমি তখন নিজেকেই সার্বভৌম ভাবছো। মনে করছো ‘আমি’ ‘আমি’। আমি কষ্ট করে যা পেয়েছি তা আমারই কৃতিত্ব। এই ভাবনাটিই হলো এক দুর্বিনাশী ভাবনা। মানুষ ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে যা সুখ পায়– প্রতিটির জন্য আল্লাহ তায়ালারই কৃতিত্ব।

মোদ্দাকথা মানুষের কোন কৃতিত্ব আল্লাহর সামনে পেশ করার যোগ্যতা রাখেনা। কারণ, মানুষ ও তার সকল কৃতিত্ব আল্লাহর সৃষ্টি। আমরা আল্লাহর রাজত্বের প্রজা। আমাদের সকল প্রয়োজন ও প্রয়োজনাতিরিক্ত সকল কিছু আসে আল্লাহর নিকট থেকে। আর আল্লাহ সেসব দেন পরীক্ষা করার জন্য– এভাবে যে, মানুষ কি ভাবে সে নিজেই নিজের স্রষ্টা কিংবা তার অর্জন নিজেরই অর্জন? ফলে সে কি হয়ে যায় এক প্রভু? অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর প্রতিদ্বন্দী হয়ে যায় যখন সে ভাবে যে, তার সুখ ও এই

সুখের জন্য যে কষ্ট সে করেছে তা তার নিজের কৃতিত্ব। অন্যকথায় সার্বভৌমত্বে আল্লাহর প্রতিদ্বন্ধী সকল মানুষ আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত এবং সে যুদ্ধে মানুষই পরজিত হবে। সে মুক্তি পাবে কেবল এই চেতনায় যে– সার্বভৌমত্ব– কারণ, প্রকারে, বিভাগে, শ্রেণিতে, বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর। এই চেতানার পরীক্ষাই হলো সুখের পরীক্ষা।

এতক্ষণের এই নাতিদীর্ঘ আলোচনা পাঠ করে কোন পাঠক যেন বিভ্রান্ত না হন সেজন্যে, আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করছি। মানুষকি

পরীক্ষার ভয়ে সুখের আকক্ষা করবে না? আসলে সুখ কেবল নেতিবাচক পরীক্ষার বা ফেল করিয়ে দোযখে নিয়ে যাবার জন্য কোন পরীক্ষা নয়। সুখের সাথে আরেকটি জিনিষ জড়িত। সেটি হলো সুখ একটি বড় নেয়ামত যা ব্যবহার করার জন্যও একটি বড় ক্ষেত্র রয়েছে। সুখি মানুষের ব্যস্ততা কম, দুঃখ কম, রোগ-ব্যাধি কম। তাই সে অনেকটাই ফুরশত পায় পজিটিভ চিন্তা এবং পজিটিভ কাজের।

এই পজিটিভ চিন্তা হলো-আল্লাহর জন্য মনে ভালোবাসা লালন, আল্লাহর মাখলুককে আল্লাহর

ওয়াস্তে ভালোবাসা ও সাহায্য করা। অর্থাঃ Reaching out to fellow creatures. সুখী মানুষের পক্ষে আল্লাহর ইবাদাত করা সহজ এবং তা প্রচুর পরিমাণে করাও সহজ। ফলে গুণী মানুষ আল্লাহর নিকটবর্তী হবার জন্য ফিট। ইবাদাত বন্দেগীর মাধ্যেমে মানুষ আল্লাহ কে বেশী চিনতে পারে, আল্লাহর বেশী নিকটবর্তী হতে পারে। সুখী হবার এটাই বড় প্লাস পয়েন্ট। উপরন্তু সম্পদ বেশী থাকে সুখী মানুসের নিকট। সেই সম্পদ দিয়ে দুঃখী মানুষের সাহায্য সহযোগিতা করে সেসব দুঃখী

মানুষের অন্তরের দোয়া সুখী মানুষের Status আল্লাহর বান্দা হিসেবে অনেক উঁচুতে যেতে পারে।

সুতরাং, সুখ কেবল নেতিবাচক হয়ে ধরা দেয় না। যখন ইসলামকে তার যাচাইকারী বানানো হয়। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে সুখ একটি অনেক বড় ইতিবাচক সুযোগ যে সুযোগ কাজে লাগিয়ে মানুষ আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে পারে এবং পরকালে অনেক উঁচু জাগাতে স্থান পেতে পারে। এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা আমাদের শিখিয়েছেন এই দোয়া, হে আল্লাহ, আমাকে দুনিয়ায়

হাছানা দান করুন এবং আখেরাতেও হাছানা দান করুন। হাছানা শব্দের ব্যাখ্যা অনেক দীর্ঘ। সংক্ষেপে এটি হলো সুন্দর জীবন, সুখী জীবন, স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদের নিয়ে দিন যাপন, জীবন যাপন। সেই সুখের জন্য আল্লাহর অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ইবাদাত বন্দেগী ইখলাসের সাথে আদায়, সর্বদা আল্লাহর স্মরণে থাকা, সর্বদা আল্লাহর মোশাহাদা।

যা লেখা হলো এ পর্যন্ত তাই কোল যে প্রশ্ন দিয়ে এই অধ্যায় শুরু হয়েছে তার জবাব নয়। সুখের হাকিকত আরো বিস্তৃত, আরো প্রশস্ত। আমরা

শেষ জমানার মানুষ। আমরা জীবিকা অর্জনে অনেক বাঁধা বিপত্তির সম্মুখীন বর্তমানকালে। আমাদের অনেক সময় ব্যয় করতে হয় জীবিকা অর্জনে। পড়ালেখার তেমন সুযোগ আর আমাদের নেই। তাই দীর্ঘক্ষণ এই আলোচনা আমি চালাব না। যা লেখা হলো তা নিয়ে পাঠক যদি চিন্তা করেন, তবে তিনি সংযত হবেন সুখের কারণে ভোগে মত হতে গিয়ে। ভোগকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। সুখ যেন ভোগের মাত্রা না বাড়ায়। আবার গাফেল হয়ে

আল্লাহর বন্দেগী করা থেকে যেন বিবত না হই আমরা।

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকটি ছেঅট থেকে ছোট বড় থেকে বড় বস্তু, বিষয়, ধারণা সৃষ্টি করেছেন কারণ বশতঃ। সুখ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কারণ বশতঃ। কেউ যেন সুখকে granted না ভাবে। সুখ অনেক বড় পরীক্ষা এবং অনেক বড় সুযোগ। এই দুটি কথা দিয়ে সুখকে যাচাই বাছাই করে জীবন-যাপন করা আমাদের সকলের উচিত। এই অধ্যায় এখানেই শেষ করলাম।

৩। কেন দু:খ

আল কুরআনুল কারীমে সূরা হাদীদের ২২-২৩ নং আয়তদ্বয়ে আল্লাহ বলেন, “দুনিয়ার উপর কিংবা তোমাদের ওপর কোনো বিপর্যয়ই আসেনা– যা সৃষ্টির বহু আগেই একটি গ্রন্থে লেখা থাকে, আর আল্লাহ তায়ালার জন্যে এ কাজ অত্যন্ত সহজ, (এ ব্যবস্থা এ জন্যেই রাখা হয়েছে) যাতে করে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু হারিয়ে গেছে তার জন্য তোমরা আফসোস

না করো এবং তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তাতেও যেন তোমরা বেশী হর্ষোৎফুল্ল না হও; আল্লাহ তায়ালা এমন সব লোকদের ভালোবাসেন না– যারা ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রদর্শন করে।" (সূরা আল হাদীদ: আয়াত ২২-২৩)।

এই আয়াতে প্রথমে দু:খ ও পরে সুখকে কীভাবে গ্রহণ করতে হবে তা আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন। দু:খকে প্রথমে উল্লেখ করার কারণ এটা হতে পারে যে– দু:খই মানুষকে বেশী কাতর করে। দু:খ সয়ে থাকা সুখ উপভোগের

চেয়ে বেশী তীব্র অনুভূতির জন্ম দেয়। সুখ উপভোগের মাত্রা এত বেশী নয় যে তা দু:খ সওয়ার তীব্রতাকে অতিক্রম করে। দু:খই সবচেয়ে কঠিন বাস্তব সমস্যা। দু:খ মানুষকে প্রথমে বিমর্ষ করে, অত:পর নিরুতসাহিত করে কর্মে, অত:পর আরো দু:খ যেমন দারিদ্র নেমে আসে, দু:খ একবার যদি সুযোগ পায় এমনভাবে যে ব্যক্তি একে বড় করে দেখে, তবে দু:খ বাড়তেই থাকে। সুখ এমন নয়। সুখকে বড় করে দেখলেও সুখ বাড়ে না। কিন্তু দু:খকে বড় করে দেখলে, অন্যকথায় দু:খকে ফোকাসে

রাখলে দু:খের পরিধি বাড়তে থাকে। তাই আল্লাহ তায়ালার পরামর্শ যে– তোমরা তোমাদের থেকে কিছু হারিয়ে গেলে বিমর্ষ হয়ো না, দু:খিত হয়ো না। হারিয়ে যাবার তালিকায় প্রথমেই আনতে হয় সুখকে। মানুষ সবচেয়ে বেশী কাতর হয় সুখ কমে গেলে। সুখ যদি সম্পূর্ণ তিরোহীত হয় তবে দু:খ হয়ে যায় অপরিসীম। তাই আল্লাহর পরামর্শ হলো- যত কিছুই হারিয়ে যাক তোমাদের জীবন থেকে, তা সম্পদ হোক, সন্তান হোক, সম্মান হোক, নিকট জনের মৃত্যু হোক, আশা অপূর্ণ থেকে যাক–

যাই হারিয়ে যাক না কেন- তোমাদের তাতে বিমর্ষ হবার কোন কারণ আসলে নাই।

কেন? কেন দু:খ আসবে আর কেন তাকে সইতে হবে? এই প্রশ্নের জবাব আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন এভাবে যে, দু:খ একটি বড় পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় পাশ করলে বড় ডিগ্রী মিলবে। অর্থাৎ পরকালে উচুঁ জান্নাতে স্থান মিলবে। দু:খ যদি মাস্টার্স ক্লাশের পরীক্ষা হয় তবে সুখ হাই স্কুলের পরীক্ষার সমতুল্য। এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা উদ্ধৃত আয়াতে দু:খের প্রসঙ্গ আগে এনেছেন। বলা বাহুল্য কথাবার্তার সাধারণ

নিয়ম হলো বড় বা বেশী আশ্চর্য্য বিষয়কে প্রথমে উল্লেখ করা হয়। আচ্ছা, জীবন কি মৃত্যুর চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ? এভাবে দেখলে বুঝা যাবে বিষয়টি। ধরুন, কোন ব্যক্তি জেলে বহু বছর ধরে বন্দী জীবন কাটাচ্ছে। হঠাৎ একদিন পরওয়ানা গেল ঐ ব্যক্তির জেলে থাকার মেয়াদ শেষ হয়েছে, এখন সে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন জীবনে ফিরে যাবে। এই ব্যক্তির কাছে তার জেলখানার দু:খ কষ্টে কাটানো দীর্ঘ সময়কে কিছুই মনে হবেনা বরং সে মুক্তির আনন্দে আত্মহারা হবে। সুতরাং জেল থেকে মুক্তিটি ঐ

ব্যক্তির দুটি বিষয়ের অর্থাৎ জেলে থাকা বা মুক্তি পেয়ে স্বাধীন জীবনে ফিরে যাওয়ার– মধ্যে বড় বিষয়। জেল থেকে মুক্তি লাভই ঐ ব্যক্তির কাছে দীর্ঘ কষ্টকর জেলজীবনের চেয়ে বড় বিষয় হিসেবে ধরা দেবে।

এবার দেখুন দুনিয়ার জীবন মুমিনের জন্য জেলখানার মত। মৃত্যু হলো ঐ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ। সুতরাং বড় বিষয়টি এ ক্ষেত্রে হলো– মৃত্যু। এজন্যেই সূলা আল মুলকের ২য় আয়াতে আল্লাহ বলেন, “যিনি মৃত্যু ও জন্ম সৃষ্টি

করেছেন, যাতে করে তিনি তোমাদের যাচাই করে নিতে পারেন যে, কর্মে কে তোমাদের মধ্যে উত্তম।" (সূরা আল মুলক: আয়াত ২)। এখানে কোন বিষয়টি আগে এসছে? মৃত্যু। তাহলে জীবনের চেয়ে মৃত্যু বেশী ভারী বিষয়। বেশী উল্লেখযোগ্য বিষয়। তেমনি সুখ ও দু:খ সূরা আল হাদীদের উদ্বৃত আয়াতে আল্লাহ দু:খের প্রসঙ্গ আগে এনেছেন। ফলে বলা যায় – দু:খ বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যেই আমি বলেছি– সুখের পরীক্ষায় পাশ করলে হাইস্কুল পাশ আর

দু:খের পরীক্ষায় পাশ করলে একেবারে এম.এ. পাশ।

অন্যদিকে দু:খের পরীক্ষায় পাশের জন্য জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ভক্তি, ভালোবাসা, ধৈর্য্য, কৃতজ্ঞতা, ইত্যাকার অসংখ্য ভালো ভালো গুণাবলীর প্রয়োজন হয়। তদুপরি দু:খের পরীক্ষায় পাশ করতে গেলে– অন্তরের গভীরে আল্লাহর জন্য সীমাতিরিক্ত মহব্বত থাকতে হয়। যে কোন দু:খ আসুক, শরীর কষ্ট পাক, মন কষ্ট পাক, অশ্রু বর্ষিত হোক, কিন্তু অন্তরের গভীরে এগুলো কোন ছায়া বা অন্ধকার সৃষ্টি করে না যদি

অন্তরের গভীরে আল্লাহর জন্য অধিক থেকে অধিক ভালোবাসা মহব্বত থাকে।

এখন দেখুন– আল্লাহর সৃষ্ট এ জগতে আল্লাহ মানুষকেই কেবল এ যোগ্যতা দিয়েছেন যে, সে যা ইচ্ছা করে কিছু করার উদ্যোগ নিতে পারে। এখন কেউ যদি ইচ্ছা করে আল্লাহকে ভালোবাসবে তবে সে যোগ্যতাও আল্লাহ তাকে দিয়ে রেখেছেন। প্রতিটি মানুষের অন্তরের গভীরে আল্লাহ চেতানা থাকে। যারা মুমিন তাদের অন্তরে সেই আল্লাহ চেতনা থেকে ঈমানের বীজ অংকুরিত হয়। সে অংকুরিত

ঈমানের চারা পরিচর্যার মাধ্যমে বিশাল মহীরুহে পরিণত হতে পারে। কীসের মহীরুহ? আল্লাহর জন্য মহব্বতের। এই এশকে এলাহীর মহীরুহ সকল দু:খের প্রখর রৌদ্র থেকে বাঁচিয়ে আল্লাহর বান্দাকে প্রফুল্ল রাখে। যে কোন দু:খ বা কষ্টকর কিছু সেই মুমিনের উপর আপতিত হোক সে বলবে– "আলহামদুলিল্লাহী আলা কুল্লি হাল।" অর্থাৎ সকল অবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকে সে।

এখন দেখুন- দু:খের অবস্থায় আল্লাহর প্রশংসায় লিপ্ত থাকা আর সুখের অবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা

করা এ দুটি কিন্তু সমান নয়। নিঃসন্দেহে দুঃখের অবস্থায় আল্লাহর প্রশংসায় লিপ্ত থাকা অত্যন্ত উচ্চ এক যোগ্যতা। এই যোগ্যতা অর্জিত হলে- ব্যক্তি এম.এ. নয় ডক্টরেটের সমান। আর সুখের অবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করা নিঃসন্দেহে অনেক বড় যোগ্যতা কিন্তু তা প্রথমোক্ত যোগ্যতার চেয়ে কম।

দুঃখের পরীক্ষা হলো– আল্লাহর জন্য মহব্বতের পরীক্ষা। অন্তরের গভীরে আল্লাহর মহব্বত থাকলে দুঃখ ব্যক্তিকে কাবু করতে অক্ষম। দুঃখ

তখনই মানুষকে বেড়াজালে আটকে ফেলে যখন- অন্তরে আল্লাহর জন্য মহব্বত কম থাকে।

এখন দেখুন অন্তর কি প্রকাশিত অঙ্গ না গোপন অঙ্গ। নিশ্চয়ই গোপন। গোপন কোন কুঠুরিতে কী গচ্ছিত রাখা হয়? স্বর্ণ, রৌপ্য, মনি, মুক্ত যা অত্যন্ত দামী। আল্লাহর জন্য মহব্বত মণি-মুক্তা সদৃশ্য, তাই তা লুকিয়ে থাকে গোপন কুঠুরি মানুষের অন্তরের গভীরে। যার হৃদয়ে আল্লাহর জন্য প্রেম আছে সে সহজেই সকল দু:খকে জয় করে আল্লাহর বন্দেগীতে প্রফুল্লচিত্তে লিপ্ত থাকতে সক্ষম। ব্যক্তির মর্যাদা তখন আল্লাহর

কাছে প্রকাশিত, হয়তোবা অন্য কোন মানুষই তার ঐ মর্যাদা সম্পর্কে অবগত থাকে না বা হতে পারে না। আল্লাহই জানেন কার কী দু:খ আর সেই দু:খকে কে কীভাবে নিচ্ছে। সুতরাং দু:খী মানুষই বেশী এনআম পাওয়ার যোগ্যতা লাভ করতে পারে। এজন্যে আল্লাহ দু:খ সৃষ্টি করেছেন। সংক্ষেপে এই হলো – দু:খ কেন – এই প্রশ্নের জবাব ও ব্যাখ্যা।

আল্লাহ বলেন, “প্রতিটি জীবকেই মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে; (হে মানুষ) আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো (এ উভয়) অবস্থার মধ্যে ফেলেই

পরীক্ষা করি, অতঃপর (তোমাদের) আমার কাছেই ফিরিয়ে আনা হবে।” (সূরা আল আম্বিয়াঃ আয়াত ৩৫)। এখানে আল্লাহ প্রথমে মন্দ অর্থাৎ দু:খকর বিষয় ও পরে ভালো অর্থাৎ সুখকর বিষয় এনেছেন এবং বলছেন যে, দু:খ ও সুখ উভয়টিই তোমাদের পরীক্ষার জন্য। দু:খ বা মন্দের পরীক্ষা প্রথমে উল্লেখিত হয়েছে পূর্বোক্ত আলোচনায় যা বলা হয়েছে তেমন কারণেই। অর্থাৎ দু:খের পরীক্ষাই বড় পরীক্ষা– দুখের পরীক্ষায় পাশ করবে কেবল তারাই যাদের অন্তর ছেয়ে আছে আল্লাহর মহব্বত।

দুখের পরীক্ষা হলো এশকে এলাহীর পরীক্ষা।

সুখের পরীক্ষা হলো সাধারণ ঈমানের পরীক্ষা।

এ অধ্যায় এখানেই শেষ করছি।

৪

সুখ ও দু:খ সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা

সূরা আল হাজ্জ এর ১১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- “মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যে ঈমানের প্রান্তসীমার ওপর (থেকে) আল্লাহ তায়ালার এবাদত করে, যদি (এতে) তার কোনো (প্রার্থিব) উপকার হয় তাহলে সে

(ঈমানের ব্যাপারে) নিশ্চিত হয়ে যায়, কিন্তু যদি কোনো দু:খ কষ্ট তাকে পেয়ে বসে তাহলে তার মুখ পুনরায় (কুফরীর দিকেই) ফিরে যায়, এভাবে সে দুনিয়াও হারায় এবং আখেরাতও হারায়, আর এটা হচ্ছে আসলেই এক সুস্পষ্ট ক্ষতি।" (সূরা আল হাজ্জ: আয়াত ১১)। এই আয়াতের মর্ম অত্যন্ত সুগভীর। আমাদের বুঝতে হবে যে, ঈমান দিয়ে সুখ কেনা যায় কিন্তু সেই সুখ ঈমানকে স্থায়ীত্ব দেবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। আবার দু:খ এলে, আল্লাহ নারাজ এমনটা ভেবে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে চলে গিয়ে

কুফরীতে লিপ্ত হওয়াটাও সম্ভব। সুতরাং সুখ-দু:খ ঈমানের পরীক্ষা। তবে সুখও ঈমানের সার্টিফিকেট দেবে না, দু:খও ঈমানের সার্টিফিকেট দেবে না। বরং সুখে থেকেও ঈমানকে নিয়ে শংকিত থাকা যে– হায়, কখন না জানি আমার ঈমানে কমতি এসে যায়, এটি অত্যন্ত জরুরী এক চেতনা। আবার দু:খে থেকেও আল্লাহর প্রতি এতটুকু অভিযোগের তীর তাক না করা– এটিও অত্যন্ত জরুরী এক চেতনা। এই আয়াত আমাদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে যায়– সূরা হাদীদের ঐ আয়াতে।

“(বির্পয়ের এ ব্যবস্থা এ জন্যেই রাখা হয়েছে) যাতে করে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু হারিয়ে গেছে তার জন্য তোমরা আফসোস না করো এবং তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তাতেও যেন তোমরা বেশী হর্ষোৎফুল্ল না হও।” (সূরা আল হাদীদঃ আয়াত ২৩)। অর্থাৎ মুমিনের জীবন হলো এক ভাসাম্যপূর্ণ জীবন। সুখেও উতলা হয় না, দু:খেও মুষড়ে পড়ে না। কেন তেমনটি না হবে? বাস্তবতা তো হলো এই যে, প্রকৃত অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। আমরা আল্লাহর সৃষ্ট কৃতদাস। আমাদের জন্য

যখন যে ফায়সালা আল্লাহ থেকে নেমে আসে– তাতে আমাদের পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি চাইতেন তাহলে ওহুদ পর্বতকে স্বর্ণে পরিণত করা আল্লাহর জন্য মামূলি বিষয় ছিল। কিন্তু না- নবী (সাঃ) দু:খ কষ্টের জীবনকেই বেছে নিয়েছেন। দিনের পর দিন ক্ষুধার্ত থেকেছেন। তা সত্ত্বেও আল্লাহর ইবাদত করা, সকল মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা, সকল দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করা থেকে তিনি বিরত হন নি।

দুনিয়া আজ আনন্দ আর বিষাদের সাগরে ভাসছে। মানুষের হাতে উঠে এসেছে পাপের বাক্স– যা দিয়ে পাপের সুখ সহজেই কেনা যায়। অন্যদিকে এই পাপের বাক্স বানানেওয়ালারা ও তাদের দোসরদের অর্থে ঈমানদারদের জীবনগুলোকে দুর্বিষহ করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বিশ্ব আজ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি– সুখ কিনে কিনে আর সেগুলো বানাতে গিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন থেকে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়াসহ নানাবিধ সর্বনাশা সমস্যায় বিশ্ব আর জর্জরিত। সমগ্র বিশ্ব মুসলিম বিদ্বেষীতে পরিণত কারণ, মুসলমানরা

পাপের বাক্সের মুখটা বন্ধ রাখতে চায় আর সেটি বিশ্বের অধিকাংশ লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এরা বলছে পাপের বাক্স বানানো বন্ধ কর, ওরা বলছে- আমাদের পাপের বাক্স চাই ই চাই। অর্থাৎ সুখ কিনতে গিয়ে দুনিয়ার মানুষ সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবার সম্মুখীন।

এর চেয়ে কম খেয়ে, কম পরিধান করে, আল্লাহর ইবাদতের স্বাদ অন্তরে নিয়ে দুটো দিন পার করে দেয়াই কি উত্তম ছিল না ! কিন্তু কেউ বুঝছে না। যারা বুঝছে তারা শক্তিহীন।

শক্তিমানেরা অর্থের পাহাড় গড়ে তুলছে- ঈমানদার শক্তিহীনেরা কিছুই করতে পারছেনা নিজেদের বাঁচার জন্য। এই ভারসাম্যহীন পৃথিবীতে কতদিন মানবজাতি টিকে থাকবে সেটি এখন অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। নাটের গুরু, ন্যাটোর গুরু ট্রাম্প বাবাজি আর নেতানিয়াহুর গোষ্ঠি সামান্যতম জ্ঞান বা প্রজ্ঞা রাখে না। বাস্তবতা যে আল্লাহ এবং আপাত বাস্তবতা যে দ্রুতই লয় পেয়ে বিয়ামতের নিকটবর্তী– এই জ্ঞানটুকু এরা গলাধ:করণ করতে পারে না। মদের বোতল এক শ্বাসে গিলে ফেলতে পারে

কিন্তু একটি কালেমা– “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ” ছোট্ট এই কালেমাকে এরা গলার নীচে নামাতে পারে না। তাদের শ্লোগান যে, “Long live devil, we are with you forever.”

এই বিষাক্ত পরিবেশ থেকে আল্লাহপাক আমাদের মুক্তি দেবেন– আবার পৃথিবী জুড়ে আল কুরআনের চর্চ্চা হবে, আল হাদীসের চর্চ্চা হবে। আলেম, ওলীগণের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। এইতো চাই কায়মনো বাক্যে। হে আল্লাহ– আমার ঈমানকে বিশুদ্ধ ও সুউচ্চ করে

দিন। এই পুস্তিকার পাঠকদেরকেও অনুরূপ দিন। আমীন।

৫

কঠিনে সহজতা, দু:খে সুখ

এ অধ্যায়ে আমি তিনটি বিষয় লিখব। এগুলো হলো:

১। নিরঙ্কুশ কঠিন অবস্থা থাকে না;

২। দু:খেও মানুষ প্রফুল্ল থাকতে পারে;

৩। সেই কঠিনে ও দু:খে কীভাবে সুখী হওয়া যায়।

আল্লাহ তায়ালা সূরা আল ইনশিরাহে বলেন, "নিশ্চয়ই কঠিন অবস্থার সাথেই থাকে সহজতা।" অর্থাৎ মানুষ সম্পূর্ণভাবে কখনোই কেবল কঠিন কঠিন আর কঠিন অবস্থায় আবদ্ধ থাকেনা। যদি ১ টি বিষয়ে কঠিন অবস্থা বিরাজ করে তবে অন্য দু'টি অবস্থায় সহজতা চলতে থাকে। সহজতার সংখ্যা কঠিনতার সংখ্যার পরিমাণ থেকে সবসময়ই বেশী হয়। এই দুনিয়ায় শুধু দু:খকে আল্লাহ পাঠান নি, সাথে সুখও পাঠিয়েছেন। কেবল জানতে হবে ও মানতে হবে যে, আল্লাহ কেয়ার নেন, নিচ্ছেন,

নিবেন। যদি কঠিনের সাথে সহজতা ব্যক্তি নাও দেখে কিন্তু তার ঈমান তাকে বলবে ‘একটু সবর কর, সহজতা আসছে।’ অর্থাৎ আশাবাদিতা একটি মোক্ষম উপকরণ যা কঠিনকে মোকাবেলা করে সুখী-প্রফুল্ল মানুষে ব্যাক্তিকে পরিণত করে। এজন্যেই ঈমানদারেরা দু:খেরও প্রফুল্ল থাকতে পারেন। কারণ জানেন মহান আল্লাহ যেকোন মুহূর্তে কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারেন। এই আশাবাদীতাকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন এবং একে বাস্তবে রূপায়িত করেন। সত্যিই কঠিন অবস্থায় তখন ব্যক্তি

প্রফুল্ল থাকতে পারে, কেবল আল্লাহর জন্য। আল্লাহ হাতাশাকে কুফরের বীজ বলে অভিহিত করেছেন। তাই মুমিন কখনোই হতাশ হয় না। তার আশাবাদীতা জাগরুক থাকে। একি সুখ বা সহজতা নয়? আর যখন অধিকাংশ কঠিনতা দূর হয়ে যায় তখন কি? তখনতো মানুষটি আল্লাহর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে সুখের সাগরে ভাসে। অন্যদিকে কঠিন অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ হয় বেশী। আল্লাহর স্মরণকে পারিভাষিকভাবে বলা হয় যিকর। আর যিকরই সেই লক্ষ যে লক্ষে আল্লাহ সকল ইবাদাতের বিধান দিয়েছেন।

তদুপরি সুললিত কণ্ঠে বিগলিত চিত্তে যখন বান্দা আল্লাহর নাম জপতে থাকে তখন অন্তর শত দু:খের মাঝেও শান্তি লাভ করে। এ বিষয়টি আল্লাহ বলেছেন এভাবে, “জেনে রাখো আল্লাহর স্মরণের মধ্যেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।” কী সুদূর প্রসারী ব্যাখ্যা সম্বলিত এই শব্দগুচ্ছ। যে ব্যক্তি নিয়মিত আল্লাহর স্মরণে, যিকরে লিপ্ত থাকবে– তার ঈমান শক্তিশালী হতে থাকবে। যে যা পায় তা আল্লাহর দান হিসেবে দেখবে। দু:খ হলেও সে বলবে এ আমার বন্ধুর কাছ থেকে এসেছে, সুতরাং একে মন্দ বলো না।

যদি সুখ আসে সে বলবে আল্লাহ আমায় অনুগ্রহ করেছেন, এতে আমার কোন কৃতিত্ব বা বাহাদুরী দেখাবার কিছু নেই। সে তখন বিনয়ে বিগলিত চিত্তে আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত হবে।

এই হলো কঠিনেও সহজতা, দু:খেও সুখ– এর ব্যাখ্যা।

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

৬। শেষ কথা

আল্লাহ পাকের দরবারে অশেষ শোকর, কৃতজ্ঞতা জানাই তিনি আমাদেরকে মানুষ হিসেবে, অত:পর মুসলিম হিসেবে এই দুনিয়াতে ক্ষণিকের জন্য পাঠিয়েছেন। আমরা ছিলাম রুহের জগতে, সেখান থেকে এসেছি মায়াময় দুনিয়াতে, অত:পর যাব প্রকৃত, বাস্তব পরকালে। আল্লাহ পাক যদি না চাইতেন যে– আমি মুসলিম হই তবে এটা কিছুতেই সম্ভব ছিল

না যে আমি মুসলিম হবো। তাই আমি মুসলিম এটা আমার কৃতিত্ব নয় বরং আল্লাহর দান। যখন দান দাতা থেকে গ্রহীতার দিকে যায় তখন গ্রহীতা দাতার মর্যাদা অনুযায়ী দান হিসেবে পাওয়া বস্তুর কদর করে। কারো ঘরে যদি দেশের প্রেসিডেন্টকর্তৃক দেয়া কোন উপহার থাকে, তখন সে বাড়ির সকলেই যখনই সুযোগ পায় মানুষকে তা দেখায় ও গর্বভরে বলে– মহামান্য প্রেসিডেন্ট এটা আমাদের উপহার দিয়েছেন।

এখন দেখুন আমরা জীবন পেয়েছি মহাবিশ্বের মহান অধীশ্বর আল্লাহর কাছ থেকে। সুতরাং আমাদের কি আনন্দে উদ্বেল ও কৃতজ্ঞতায় বিনত হওয়া উচিত নয় যে– মহাজগতের মহান রাজাধিরাজ আমাদেরকে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় প্রাণটি দিয়েছেন। সে সাথে এই জীবনের কতই না কদর করা উটিত কেননা এটা এসেছে মহাবিশ্বের রাজাধিরাজের উপহার হিসেবে। সুতরাং মানবত্ব ও মুসলমানিত্বই মুখ্য। সুখ বা দু:খ কখনোই মানবত্ব ও মুসলমানিত্বের চেয়ে বড় হয়ে যায় না।

সুখ ও দঃখ আমাদের মুসলমানিত্বের স্তর বা Status নির্ধারণকারী একটি পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় আমাদের পাশ করতেই হবে। ফেল করলে আমাদের জীবন হয়ে যাবে পশুরও অধম। আখেরাতে তখন কোন মর্যাদা তো পাওয়া যাবেই না– বরং অবর্ণনীয় যন্ত্রণাদায়ক দোযখের অধিবাসী হতে হবে। এজন্যেই সকলকেই সতর্ক হয়ে দুনিয়ার জীবন ব্যয় করতে হবে– আল্লাহর রাহে। এ হলো ইশকে এলাহীর জীবন। মুসলিমের জীবন হলো এক প্রেমিকের জীবন। মহান রাজাধিরাজ আল্লাহর

জন্য প্রেম বা মহব্বত।এ প্রেমে মজে গেলে দুনিয়ার দু:খ কষ্ট মোটেও কষ্টকর মনে হবে না। সুখ পেলেও আহামরি কিছু ভাবা হবে না। আল্লাহ বলেন ”আল্লাহর যিকরই সর্বশ্রেষ্ঠ।” আল্লাহর হুকুম হোক, আমরা আল্লাহর যিকরে লিপ্ত হই এবং সুখী হই।